# ছেচল্লিশের নোয়াখালি ও চপলাকান্ত

‘নিষিদ্ধ’ পুস্তক, দুষ্প্রাপ্য দলিল

সম্পাদনা
মধুময় পাল

পুনশ্চ

# বিষয় সূচি


| | | |
|---|---|---|
| নদী-ভেজা বাংলার রক্তে ভেজা অপমানচিত্র | মধুময় পাল | ৯ |
| পর্ব এক | | ৪১ |
| নোয়াখালির ধ্বংসকাণ্ড | চপলাকান্ত ভট্টাচার্য | ৪৩-১৪২ |
| পর্ব দুই | | ১৪৩ |
| রাষ্ট্রপতি কৃপালনির বিবৃতি | | ১৪৪ |
| পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতি | | ১৪৭ |
| সর্দার বল্লভভাই পটেলের বিবৃতি | | ১৪৮ |
| ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি | | ১৪৮ |
| শরৎচন্দ্র বসুর বিবৃতি | | ১৫১ |
| সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের বিবৃতি | | ১৫৩ |
| সুচেতা কৃপালনির বিবৃতি | | ১৫৪ |
| মিস মুরিয়েল লিস্টার বর্ণিত কাহিনি | | ১৫৭ |
| এ. ভি. ঠক্করের বিবৃতি | | ১৫৯ |
| সামসুদ্দীন আমেদের স্বীকৃতি | | ১৬১ |
| ডা. সৈয়দ মামুদের বিবৃতি | | ১৬৪ |
| An open letter to the Governor of Bengal– Leela Roy | | ১৬৪ |
| পর্ব তিন | | |
| নোয়াখালিতে ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউটের সেবা কাজ— উমা দেবী | | ১৬৯ |
| নোয়াখালিতে গান্ধীজি— নির্মলকুমার বসু | | ১৭৪ |
| নোয়াখালি থেকে পাকিস্তান— নির্মলকুমার বসু | | ১৭৬ |
| নোয়াখালির দাঙ্গা— রসময় মজুমদার | | ১৮২ |

কমিউনিস্ট ভলান্টিয়ার বাহিনী— খোকা রায় ১৯৪
নোয়াখালিতে গান্ধী ও তার প্রতিক্রিয়া— মহম্মদ তোয়াহা ১৯৭

পরিশিষ্ট
নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত থানাগুলির
লোকসংখ্যা ও শতকরা মুসলমান জনসংখ্যা (১৯৪৭) ২০০
ধর্মান্তরকরণের দুটি নমুনা ২০২
নির্যাতনের বিবরণ (১) ২০৩
নির্যাতনের বিবরণ (২) ২০৬
সহায়ক গ্রন্থ ২০৮

# নদী-ভেজা বাংলার রক্তে ভেজা অপমানচিত্র

জনবিরল রাস্তায় মোটরগাড়িতে করে যাবার সময় দেখলাম পথের দু-ধারে দু-ফুট উঁচু জঞ্জালের স্তূপ জমা হয়ে রয়েছে। যতদূর চোখ যায়, পাশের রাস্তা আর গলিগুলোতে আসবাবশূন্য দোকান এবং পোড়া বাড়ির সারিই চোখে পড়ে। এইসব দেখে যখন ভাবি মানুষের দলবদ্ধ উন্মত্ততা তাকে জন্তুরও অধম করে তুলেছিল, তখনই এক দমবন্ধ-করা অনুভূতিতে মন অভিভূত হয়ে ওঠে। এইরকম অবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। মানুষের প্রকৃতি এটা সহ্য করবে না।

(মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, নোয়াখালির ডায়েরি)

## যে জিজ্ঞাসার সামনে রুদ্ধবাক মানবতা

রাত্রি তখন বেশি হয়নি। হঠাৎ হিন্দু পাড়ার একদিকের আকাশের কোল লাল হয়ে উঠল। বাবা গোপাল দত্ত সুতারাকে পড়াচ্ছিলেন। রান্নাঘরে ছিলেন দিদি আর মা। বেরিয়ে এসে আকাশ দেখে মা বললেন, দেখো দেখো, ঘোষালবাড়ির দিকে যেন আগুন লেগেছে। বাবা বললেন, করিম, একবার যা তো ওইদিকটা দেখে আয়। মা জানালেন, রহিম আর করিম সন্ধেবেলা ছুটি নিয়েছে। কোথায় যাত্রা শুনতে যাবে যেন। 'আগুন খুব বেড়ে উঠছে, আমি একটু দেখে আসি' বলে বাবা বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে বললেন, তোমরা ওই কোণের ছোটো ঘরে দরজার খিল দিয়ে বোসো। ঘর থেকে বেরিয়ো না। ডাকলেও না। ধাক্কা দিলেও না। আমি একবার তমিজ সাহেবের বাড়ি যাই।

তমিজুদ্দিনের বাড়ি মুসলমান পাড়ায়। সুতারাদের হিন্দু পাড়ায়। বেশি দূরে নয়। মাঝখানে একটা বাগান।

সুতারা মা-কে জিজ্ঞেস করে, কীসের আগুন? এ সময় তো বাজি পোড়ানো হয় না। মা বলেন, কী জানি! ওই দেখ হইহই হচ্ছে শোনা যাচ্ছে। চল, ঘরে চল। দিদি থরথর করে কাঁপছিল। হঠাৎ তাদের বাগানেও আগুন লাগল। গোয়ালের মাঝে গোরুগুলো ভয়ে ডাকতে লাগল। 'গোয়ালের চালায় আগুন লাগল কি' বলে মা দরজা খুলে বেরোতে যাবেন, দেখেন করিম, রহিম ও আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে। মা ওদের বললেন, গোরুগুলোকে খুলে দিয়ে আয়। ওরা দাঁত বের করে হাসতে লাগল।

দিদি 'ও মা, বাবা' বলে তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাটিতে পড়ে গেল। কালো কালো অনেক ছায়া মা-র পেছনে জড়ো হয়েছে। মা তাদের হাত এড়িয়ে খিড়কির পুকুরে ঝাঁপ দিলেন। সুতারা মা-র কাছে ছুটে যেতে গিয়ে কীসে পা আটকে পড়ে গেল।

যখন তার জ্ঞান ফিরল, মা-বাবা-দিদিকে সে পেল না, দেখল সে শুয়ে আছে তমিজকাকার বাড়িতে, তার পাশে সাকিনা, তমিজকাকার মেয়ে আর কাকিমা। তার মনে পড়ে, এইসব ঘটেছিল। কিন্তু সে বুঝতে পারে না কেন সে এইখানে। বাবা কোথায়, মা কোথায়, দিদি কোথায়? এই জানতে চাওয়া উত্তর পায় না। তমিজকাকা, কাকিমা, সাকিনা, মৈনুদ্দিনরা জিজ্ঞাসার সামনে রুদ্ধবাক। তাঁরা অন্য কথায় পালিয়ে যান। ক্রমে, অনেকটা সময় পরে, সুতারা জানতে পারে, তার বাবাকে কারা ছুরি মেরে খুন করে ফেলে গেছে নর্দমায়, মা মারা গেছে পুকুরে, দিদিকে কারা যেন তুলে নিয়ে গেছে।

নয় বছরের সাকিনা, সুতারারা খেলার সাথি, আপনমনে ভাবে, কেন এমন হয়? ওই হিঁদুরা তো কিছুই করেনি। তার জিজ্ঞাসাও জবাব পায় না মায়ের কাছে, দাদাদের কাছে।

সাকিনার মা একদিন স্বামীকে বলেন, তোমাদের দেশভাগ চাই। ঝগড়া করবে করো। আমাদের মেয়েদের মান-ইজ্জত-শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? এ কি তোমাদের ধর্মে বলে? কোরানে আছে? তোমরা এতসব শিক্ষিত— গাঁয়ের উকিল মোক্তার মাস্টার— কেউ কাউকে কিছু বলছ না কেন? তমিজুদ্দিন জবাবে যা বলেন তাতে বোঝা যায় মানবিক সুস্থতা দিশা হারিয়েছে, ধর্মীয় বিদ্বেষের বিষযন্ত্রণা সমাজের গভীরে ঢুকেছে।

কেন সুতারা সব হারায়, নিতান্ত বালিকাবয়সে একা হয়ে যায়, কেন মানুষ এভাবে মানুষকে খুন করে, জবাব নেই। যে জবাব আছে, তা ধর্মীয় কূটবুদ্ধির, মানুষের বোধের নয়।

'এক নিমেষে পলকের মধ্যে একটি চিরকালের শান্ত গ্রামজীবনের মাঝে কোনো

বিধাতার ইঙ্গিতে কোনো অজানা কারণে পুরুষের প্রাণ, নারীর মান, পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি কেমন করে ধ্বংসলাঞ্ছিত লুপ্ত হয়ে গেল। এ জবাব কী করে কে দেবেন? আর গেল যারা তারা গেল, চিরকালের বন্ধু-প্রতিবেশীদের হাতে দিয়েই, বিনা অপরাধেই। এ লজ্জার কথাই বা তমিজুদ্দিন সাহেব কী করে বলবেন। কী করে বলবেন তাঁরা কাউকে রক্ষা করতে পারেননি— ইচ্ছা থাকলেও।'

ওপরের অংশটি 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসের প্রথম দশ পৃষ্ঠার সংক্ষেপসার। মাত্র কয়েক লাইনে ১৯৪৬-এর নোয়াখালি গণহত্যার মর্মচিত্রটি উন্মোচিত করেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। উত্তরহীন আমাদের দাঁড় করিয়ে রাখেন চিরজীবিত জিজ্ঞাসার সামনে। নোয়াখালিতে যা ঘটেছিল, আজও তা হুবহু না হলেও ঘটে, নানা অছিলায় নানা মাপে, বিদ্বেষের আগুনে মানুষকে পুড়িয়ে তরতাজা বেঁচে থাকে মৌলবাদ। উপন্যাসটি লেখা হয় ১৯৬৭ সালে, ঘটনার ২১ বছর পর। এখনও সেই লেখা পড়তে পড়তে প্রশ্ন জাগে, আমরা কি সত্যি এগোতে পেরেছি? আজ, ভারতে সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় রাজনীতি দেশের মানবিকতার সামনে, সভ্যতা-সংস্কৃতির সামনে ভয়ংকর বিপদ হয়ে হাজির হয়েছে।

## 'নামহারা শুধু নয়, ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা স্বজনহারাও।'

কেমন ছিল সেদিনের নোয়াখালি, কেমন ছিল 'শান্ত গ্রামজীবন'? মনে রাখবার মতো বর্ণনা আছে অধ্যাপক মণীন্দ্র দত্তর লেখায়: বাংলার পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তে একটি স্বল্প পরিচিত জেলা। বঙ্গোপসাগরের ঢেউ অবিরাম ভেঙে ভেঙে পড়ে তার দক্ষিণ উপকূলে। পশ্চিমে দূরবিস্তার মেঘনার কালো জল। কোথাও দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত। কোথাও সুপারি-নারিকেলের সারি শ্রেণিবদ্ধ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে আঁকাবাঁকা পল্লিপথ। তার পাশে কোথাও ভাঙা কুঁড়েঘর। কোথাও বা সম্পন্ন গৃহস্থের বাসভবন, প্রাসাদোপম অট্টালিকা। মন্দিরে শঙ্খধ্বনি। মসজিদে আজান। শান্ত নিরুদ্‌বেগ জীবনযাত্রা।

আর-একটি বর্ণনায় আছে: কথায় বলে, খাল খালি নোয়াখালি। নোয়াখালির সারা দেহ চিরে অসংখ্য ছোটো-বড়ো খাল ও দাঁড়া (বর্ষাকালের অস্থায়ী সরু সরু জলপথ) বয়ে গেছে। নামকরা খালের মধ্যে কৈকলার খাল, গন্ধর্বপুরের খাল, হরিণ বিবির খাল, রঞ্জন বিবির খাল। প্রত্যেকটি বড়ো-ছোটো রাস্তার গাঁ ঘেঁষে খাল চলে গেছে দূরদূরান্তরে।

৩২টি পরগনা এবং প্রায় পৌনে তিন হাজার গ্রাম নিয়ে গঠিত নোয়াখালি জেলা। প্রত্যেকটি বড়ো পরগনার নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ইতিহাসের উপাদান ও কিংবদন্তি। বহু গ্রামের নামকরণে আছে ইতিহাসের খবর ও ভূপ্রাকৃতিক পরিচয়।

জেলায় শিক্ষাবিস্তারের প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, ১৮৮৬ সাল থেকে ১৯৪৬ পর্যন্ত— ৬০ বছরে ৬৫টি হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গড়ে উঠেছে শিক্ষিত সমাজ। সংখ্যায় কম হলেও শিক্ষিত মুসলমানও সেখানে ছিল। তবে ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে বেরোতে পেরেছেন খুব কম জন।

নোয়াখালির মানুষ, বামপন্থী চিন্তাবিদ ও বাংলার ভাষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসকার গোপাল হালদার ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, মুসলমানরা ধর্মের প্রতি এতটাই অনুগত যে মানবিক দিকগুলি তাদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। ধর্ম তাদের স্বাভাবিক বিচারবোধ থেকে দূরে রাখে। গরিব সাধারণ মুসলমানরা তো বটেই, শিক্ষিতরাও এই আচার-ধর্মের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না। বামপন্থী দর্শনে বিশ্বাসী মানুষটি মুসলিম বন্ধুদের মধ্যে এই গোঁড়ামি দেখে বিস্মিত হয়েছেন, কষ্ট পেয়েছেন। 'রূপনারানের কূলে' শিরোনামের তাঁর আত্মকথায় বলেছেন, নোয়াখালি মৌলবি-মৌলানারই জায়গা। হিন্দুদের মধ্যে গুরু-পুরোহিতদের প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু ইংরেজি শিক্ষায় হিন্দুদের উপর তাঁদের বিষক্রিয়া ক্রমেই কমে। অথচ মৌলবি-মৌলানাদের প্রভাব বাড়ে। ফিউডালিজমের ভার ওখানকার মুসলমানদের উপর পাকা থেকেছে— কারণ রেনেসাঁস, রিফর্মেশনের ভাবধারা উনিশ শতকে মুসলমানসমাজে প্রায় দেখা যায়নি। গোঁড়ামি বরং প্রবলতর হয় নন-কোঅপারেশন-খিলাফত আন্দোলনের সময় থেকে। তবে নোয়াখালিতে বরাবরই মক্তব-মাদ্রাসার সংখ্যা ছিল অনেক। সাধারণ মুসলমানের ধর্মবিশ্বাস ছিল সরল ও অনড়, বিচারবোধ থাকত খর্বিত। ওয়াহাবি আন্দোলনও প্রত্যক্ষভাবে তাদের দু-একজনকে স্পর্শ করেছিল বলে জানি। তাঁরা দু-একজন যুদ্ধ করতে ছুটেছিলেন পাঞ্জাবে। সে ওয়াহাবি মানসিকতা পরোক্ষে বোধহয় জাগাত অন্যদের মনে অনুরূপ কোনো ধর্মকেন্দ্রিকতা। ইসলাম ইন ডেঞ্জার বলে ডাক দিলে সাধারণ মুসলমানও সেখানে বিনা প্রশ্নে জীবনপণ করতে পারে, তা বুঝতাম। রোজা-নামাজ-জাকত-হজ কেন, দাড়ি না রাখলেই গোনাহ্।... ব্যারিস্টার লুতফ আলীর মতো দু-একজন ছাড়া মুসলমান শিক্ষিতরাও খুব স্বচ্ছ উদার দৃষ্টি আয়ত্ত করতে পারলেন না। সাহসও পেতেন না। আমার একটি মুসলমান সহপাঠী বন্ধুর কথা বলছি। তিনি সুশিক্ষিত, পদস্থ পরিবারের ছেলে। কথাপ্রসঙ্গে একদিন আমি আমার সহপাঠী বন্ধুকে বললাম, 'আমরা অর্থ ঠিক বুঝি না। না হলে দেখুন— ঈশ্বর সকলেরই এক। সব ধর্মই তাই সত্য, সব ধর্মই সমান।'

আমার বন্ধু কিন্তু প্রবল স্বরে প্রতিবাদ করলেন, 'না, মুসলমান হয়ে আমি এ কথা মানতে পারব না। মুসলমান ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম সত্য নয়।' যে তীক্ষ্ণতা তাঁর কণ্ঠে ছিল তা পূর্বে অন্য আলোচনায় কোনোদিন তাঁর মধ্যে দেখিনি। আমি কেমন বিমূঢ় হলাম। যত মত তত পথ— আমার বিশ্বাস ছিল এ কথাটায় এ যুগের শিক্ষিত

মানুষের অনুমোদন স্বাভাবিক। বুঝলাম তা ঠিক নয়, অন্তত নোয়াখালিতে নয়। না হলে বন্ধুটি ছিলেন শিক্ষিত, সৎস্বভাব ও উদার প্রকৃতিরও। তবু 'স্বদেশি'র সম্বন্ধে ছিল তাঁর সংশয়, এমনকী সন্দেহ। এরূপ গুণযুক্ত মুসলমান শিক্ষিত লোক নোয়াখালিতে আরও ছিলেন। কেউ কেউ তাঁরা ধন-মান-খ্যাতিও অর্জন করেছেন। কিন্তু মুসলমানসমাজের 'আস্থা' লাভ করতে হলে 'গোঁড়ামি'কেও যথেষ্ট মেনে চলতে হয়েছে— অন্তত তখনও। না হলে যাঁরা নিজ সমাজের হিতৈষী, দেশেরও হিতৈষী— এমন লোকও শেষ পর্যন্ত স্বজন মধ্যে পরাহত হয়ে যেতেন— ওই লুতফ আলী সাহেবের মতো।... শুধু নামহারা নয় এঁরা— বিশেষ করে ন্যাশনালিস্ট মুসলমানরা, স্বজনহারাও।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে তমিজুদ্দিন এই কথাটাই বলেছেন সাকিনার মা-কে। ধর্ম নিয়ে কাটাকাটির বিরুদ্ধে, হিন্দু মেয়েদের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে বলতে গিয়েছিলেন তিনি শিক্ষিত সমাজে। তারা বললে, নিজেদের ঘরে হিঁদুর মেয়ে নিয়ে রেখেছেন আমরা জানি। কেন নিয়ে রেখেছেন? ওঃ ওদের উপকার করছেন। আর-একজন বললে, 'দে-না, ওঁদের ঘরেও আগুন লাগিয়ে।... শুনলে আশ্চর্য হবে, যারা বলছিল তারা মূর্খ নয়, অশিক্ষিত নয়। আর ধর্মকর্মও করে।'

## ত্রিশ দশকের গোড়া থেকে সাম্প্রদায়িক প্রচার

নোয়াখালির মাটিতে সাম্প্রদায়িকতার বীজ থেকে গাছ হয়ে ওঠা দেখেছেন নলিনীরঞ্জন মিত্র। প্রথমে তিনি ছিলেন বিপ্লববিশ্বাসী। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনার কিছুদিন পর গান্ধীর অহিংস রাজনীতির অনুগামী হন। সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পরে 'মুসলিম লিগের ক্রমবর্ধমান দাপটে এবং মুসলমান রাজকর্মচারীদের স্বজাতীয় স্বধর্মীয় দুষ্কৃতীদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট আচরণে সংখ্যাল্প হিন্দুদের দুর্দশায়, বিশেষত বিভিন্ন স্থানে হিন্দু মা-বোনেদের মর্যাদাহানিতে মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে সময় উপদলীয় কোন্দলে বাংলার জাতীয় কংগ্রেস দীর্ণবিদীর্ণ। নির্যাতিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়াবার তার সময় কোথায়?' এই পরিস্থিতিতে হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন নলিনীরঞ্জন মিত্র। তাঁর লেখা থেকে সেই সময়টা বুঝে নেওয়া যেতে পারে:

যতদিন গান্ধীজি কংগ্রেসের আঁচলে খিলাফত আন্দোলনকে বেঁধে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, ততদিন সাম্প্রদায়িকতা মাথাচাড়া দেয়নি। কংগ্রেসের শ্রমে ও অর্থে ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ সংঘবদ্ধ ও জাতীয়তার আদর্শে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে তুরস্ক কামাল পাশার নেতৃত্বে ধর্মপ্রভাবমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। খিলাফত আন্দোলনে যবনিকা নেমে আসে। এরপর কংগ্রেসের পতাকার নীচে থেকে মুসলিমরা সরে যেতে থাকে। মুসলিম লিগের মুসলিম ভারত দাবি এবং মহম্মদ